**ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ**

**৭ জুন ১৯৬৬; ৭ জুন ২০২০**

সুভাষ সিংহ রায়

প্রয়াত সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক ষাটের দশকের কোন এক সময়ে লন্ডনে বিবিসি’তে কর্মরত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু সে সময়ে লন্ডনে গিয়েছিলেন। সৈয়দ শামসুল হক দু’একজন বন্ধুকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে সামনে পেয়েই সৈয়দ হক জিজ্ঞেস করে বসলেন, ছয়দফা কি একটু সহজে বুঝিয়ে দেবেন। বঙ্গবন্ধু তিনটে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেছিলেন, আমার আসলে তিন দফা। কত নিছো ? কবে দিবা ? কবে যাবা ?

১৯৪০ সালে লাহোর গিয়েছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। উত্থাপন করেছিলেন লাহোর প্রস্তাব। তা গৃহীত হয়েছিল। তৃপ্তমনে ফিরেছিলেন তিনি। কিন্তু জিন্নাহ ১৯৪৬ সালে দিল্লির কনভেনশনে ‘স্টেটস’কে ‘স্টেস’ করে দেন। এই ‘এস’ এর মাহাত্ম বুঝতে সময় লেগেছে বাঙালির। এর ২৫ বছর পর লাহোর যাত্রা করলেন আরেক বাঙালি, শেখ মুজিবুর রহমান। সেই ‘এস’ এর কথা মনে রেখেই করেছিলেন প্রস্তাব। তা প্রত্যাখ্যাত তো হলোই বরং বিচ্ছিন্নতাবাদী উপাধি নিয়ে ব্যর্থ মনে ফিরলেন ঢাকায়। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর লেখা একটি বই ‘দুই বাঙ্গালির লাহোর যাত্রা’ থেকে কয়েকটি লাইন তুলে ধরা যেতে পারে :

“বাংলার নেতা এ কে ফজলুল হকের জীবনে সবচেয়ে বড় কাজ কোনটি? ঋণসালিসী বোর্ড প্রতিষ্ঠা, না-কি পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন? দুটি দুই মাত্রার কাজ এবং উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ। গোটা পাকিস্তান আমলজুড়ে শুনেছি আমরা যে, হক সাহেব বিখ্যাত এই জন্য যে তিনি লাহোর গিয়ে সেই বিখ্যাত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন, যার ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হ্যাঁ, ঋণসালিসী বোর্ডের ব্যাপারটাও শোনা গেছে। বাংলার কৃষককে মহাজনী শোষণের জোয়াল থেকে মুক্ত করবার জন্য ওই সালিসী বোর্ডের প্রবর্তন করেছিলেন তিনি। ভালো কাজ, সন্দেহ কী। কিন্তু কোন্টা কত ভালো? বাংলাদেশে আজ আমরা কাজ দুটিকে নতুন করে মূল্যায়ন করবো নিশ্চয়ই। আমরা যে কৃষকপ্রিয় হয়েছি হঠাৎ করে তা নয়, তবে পাকিস্তানকে সেই দৃষ্টিতে এখন আর দেখি না, যে দৃষ্টিতে দেখার শিক্ষা পাকিস্তান আমলে আমরা খুব করে পেয়েছিলাম। এখন পরিপ্রেক্ষিত বদলেছে, মূল্যায়নও রূপ নিয়েছে ভিন্নতর। কিন্তু সত্য এটা যে, ১৯৪০-এর সেই প্রস্তাবটি বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হকই উত্থাপন করেছিলেন। প্রস্তাবটি তাঁর নয়, মুসলিম লীগের। ভারতীয় মুসলিম লীগের সুপ্রিম কাউন্সিলে মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয় ওই বছর মার্চ মাসের ২১ তারিখে। পরের দিন অর্থাৎ ২২ তারিখে কাউন্সিল অধিবেশনে ওটি উত্থাপন করার কথা; উত্থাপন মানে ঘোষণা দেওয়া আসলে। কিন্তু ২২ তারিখে তা করা হয়নি; করা হয়েছে ২৩ তারিখে। কারণ আর কিছুই নয়, হক সাহেবের অনুপস্থিতি। ফজলুল হক তখনও এসে পৌঁছাননি, এলেন তিনি ২৩ তারিখে; তাই ২৩ তারিখেই প্রস্তাব উত্থাপন করা হলো। তিনিই করলেন। সেই দিনই তিনি ‘শেরে বাংলা’ উপাধি পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেলেন। জিন্নাহ সাহেবই দিলেন, হক সাহেবের জনপ্রিয়তা দেখে নয়, সেটা দেখা গিয়েছিল অবশ্যই, উপস্থিত সদস্যরা সকলে উঠে দাঁড়িয়েছিল একসঙ্গে, বাংলার প্রধানমন্ত্রী প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, ধ্বনি উঠেছিল তাৎক্ষণিকভাবে। জিন্নাহ সাহেব বললেন, ‘টাইগার অব বেঙ্গল’ এসে গেছেন, খুশি করবার জন্যই বললেন মনে হয়, খুশি করা প্রয়োজন ছিল। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ওই প্রস্তাবের তখনো নামকরণ হয়নি, পরে সেটা নাম পেলো পাকিস্তান প্রস্তাবের এবং মোটামুটি তার ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠা ঘটলো পাকিস্তান রাষ্ট্রের, সাত বছর পরে, ১৯৪৭ সালে।

ওই লাহোরেই আরেক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন বাংলার আরেক নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ২৬ বছর পরে, ওই মার্চ মাসের কাছাকাছি সময়েই, ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধীদলীয় নেতাদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো এবং সেখানে প্রস্তাব এলো সম্পূর্ণ উল্টো ধরনের; ৬-দফার; স্পষ্ট কথায় বলতে গেলে পাকিস্তান ভাঙার। এক বাঙালী প্রস্তাব করেছিলেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার, আরেক বাঙালী প্রস্তাব করলেন পাকিস্তান ভাঙার।

একই শহরে সময়ের কিছুটা ব্যবধানে। দুজনের প্রস্তাবই করলেন পাকিস্তান ভাঙার। দুজনের প্রস্তাবই কার্যকর হয়েছে। লাহোরে উত্থাপিত এক প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আরেক প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ভেঙে চুরমার হয়েছে।

-২-

অস্বাভাবিক ছিল কি ওই দুটি কাজ- ওই দুই উত্থাপন; প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এক বাঙালীর, ভাঙার প্রস্তাব আরেকজনের? না, হক সাহেবের কাজটা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। তিনি ছিলেন স্রোতের সঙ্গে। ওই প্রস্তাব উত্থাপন তাঁর জন্য কোনো বিপদ ডেকে আনেনি। কিন্তু শেখ মুজিবের কাজটা ছিল বিপজ্জনক। লাহোর শহর তাঁর ৬-দফার কথা শোনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। আইয়ুব তো সঙ্গে সঙ্গেই গর্জন করে উঠেছিলেন। শেখ মুজিবকে জেলে যেতে হয়েছে, ঝুঁকি নিতে হয়েছে ফাঁসিকাষ্ঠে চড়বার। তবে হ্যাঁ, ওই প্রস্তাব তাঁকে জনপ্রিয় করেছিল বাঙালীদের মধ্যে। যেমন হক সাহেবের প্রস্তাব জনপ্রিয় করেছিল তাঁকে মুসলমানদের মধ্যে।”

ছয় দফার তাৎক্ষণিক পটভূমি হিসেবে ১৯৬৫ সাল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। একই বছর মৌলিক গণতন্ত্রের নামে নির্বাচনী প্রহসন বাঙালিদের ভীষণ ক্ষুব্ধ করে। পরের বছর ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলের জাতীয় কনভেনশন লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছয় দফা কর্মসূচি উত্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। লাহোরে বাধা পেয়ে তিনি ঢাকার তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দর গণমাধ্যমে ছয় দফার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেন। বঙ্গবন্ধু ‘৬৬-এর ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে সম্মিলিত বিরোধী দলগুলোর এক কনভেনশনে বাংলার গণমানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবি সংবলিত বাঙালির ‘ম্যাগনাকার্টা’ খ্যাত ঐতিহাসিক ছয় দফা উত্থাপন করে তা বিষয়সূচিতে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সভার সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এ দাবি নিয়ে আলোচনায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে ১১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে ঢাকা বিমানবন্দরে সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। ২০ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ছয় দফা দলীয় কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। দলীয় কর্মী বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত তরুণ ছাত্রলীগ নেতৃত্বের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। বঙ্গবন্ধু বলতেন, ‘সাঁকো দিলাম, স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য। ১৯৬৬ সালে ১৮ থেকে ২০ মার্চ হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তাজউদ্দিন আহমেদ সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। এই কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা দলীয় ফোরামে পাস হয়েছিল । ১৯৬৬ সালের ১০ মের মধ্যে আওয়ামী লীগের ৩৫০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধু এটি আঁচ করে সংগঠনকে যতোটা পারেন গুছিয়েছেন। কয়েকটি স্তর করা হয়েছিল। এক স্তর গ্রেফতার হলে আরেক স্তর আন্দোলন সংগঠন করবে এই ছিল কৌশল। এই সময় ছাত্রলীগ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিল অধিবেশনটি ছিল বাঙালির ইতিহাসে বাঁক পরিবর্তন; যা ‘৬৯-এর মহান গণঅভ্যুত্থান, ‘৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচন ও ‘৭১-এর মহত্তর মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরি করেছিল। স্বভাবসুলভ কণ্ঠে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে’ উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, ‘এই আন্দোলনে রাজপথে যদি আমাদের একলা চলতে হয় চলবো। ভবিষ্যৎ ইতিহাস প্রমাণ করে বাঙালির মুক্তির জন্য এটাই সঠিক পথ।’ কাউন্সিল অধিবেশনের পর বঙ্গবন্ধু সারাদেশ চষে বেড়ান। ৩৫ দিনে মোট ৩২টি জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন। রাজনীতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস হচ্ছে শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা যিনি দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন ব্যতিরেকেই ৬ দফা উপস্থাপন করেছিলেন । দলের সাধারণ সম্পাদক হলেও শেখ মুজিব ছয় দফা পেশ করেন তাঁর ব্যক্তিগত সুপারিশ হিসেবে। কয়েক সপ্তাহ পরেই আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি দলের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ছয় দফাকে অনুমোদন করিয়ে নেন। ছয় দফা না দিলে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দলের নেতাদের ওপর নির্যাতন নেমে আসত না। সরকার আগরতলা মামলাও হয়তো ফেঁদে বসত না। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ম্যান্ডেটও ও রকম হতো না। তার পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। পূর্ববঙ্গে যারা ৬ দফার সমালোচনা করেছিলেন তাদের একটা বড় সংখ্যা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিলেন।

মুক্তিকামী বাঙালির আন্দোলনের খবরে তিনি খুশি হচ্ছেন, তাদের ওপর নির্যাতনের খবরে বিচলিত হচ্ছেন। কিন্তু কখনও তার আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেনি। ১৯৬৬-এর ৬ জুন তিনি লিখেছেন-“ত্যাগ বৃথা যাবে না, যায় নাই কোনো দিন। নিজে ভোগ নাও করতে পারি, দেখে যেতে নাও পারি, তবে ভবিষ্যৎ বংশধররা আজাদী ভোগ করবে। কারাগারের পাষাণ প্রাচীর আমাকেও পাষাণ করে তুলেছে। এ দেশের লাখ লাখ কোটি কোটি মা-বোনের দোয়া আছে আমাদের ওপর। জয়ী আমরা হবই। ত্যাগের মাধ্যমে আদর্শের জয় হয়।”

-৩-

আবার বঙ্গবন্ধু ৮ জুন তাঁর খাতায় লিখেছিলেন এভাবে। “ছয়দফা যে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রাণের দাবি-পশ্চিমা উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকশ্রেণী যে আর পূর্ববাংলার নির্যাতিত গরীব জনসাধারণকে শোষণ বেশি দিন করতে পারবেনা, সে কথা আমি এবার জেলে এসেই বুঝতে পেরেছি। বিশেষ করে ৭ই জুনের যে প্রতিবাদে বাংলার গ্রামেগঞ্জে মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে ফেটে পড়েছে, কোনো শাসকের চক্ষুরাঙানি তাদের দমাতে পারবে না। পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্য শাসকশ্রেণীর ছয়-দফা মেনে নিয়ে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করা উচিত।যে রক্ত আজ আমার দেশের ভাইদের বুক থেকে বেরিয়ে ঢাকার পিচঢালা কাল রাস্তা লাল করল, সে রক্ত বৃথা যেতে পারে না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যেভাবে এ দেশের ছাত্র-জনসাধারণ জীবন দিয়েছিল তারই বিনিময়ে বাংলা আজ পাকিস্তানে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। রক্ত বৃথা যায় না। যারা হাসতে হাসতে জীবন দিল, আহত হলো, গ্রেপ্তার হলো, নির্যাতন সহ্য করল তাদের প্রতি এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের প্রতি নীরব প্রাণের সহানুভূতি ছাড়া জেলবন্দি আমি আর কি দিতে পারি! আল্লাহর কাছে এই কারাগারে বসে তাদের আত্মার শান্তির জন্য হাত তুলে মোনাজাত করলাম। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, এদের মৃত্যু বৃথা যেতে দেব না, সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। যা কপালে আছে তাই হবে। জনগণ তাদের দাম দেয়। ত্যাগের মাধ্যমেই জনগণের দাবি আদায় করতে হবে।”

৭ জুন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। ৮ তারিখের পত্রিকা পাওয়া যায় নি। ৯ জুন দৈনিক সংবাদে সরকারি একটি প্রেস নোট ছাপা হয়েছে, সেটি বিশ্লেষণ করলে রক্ষণশীল একটি হিসাব পাওয়া যাবে-। ৭ জুন সম্পর্কে পরবর্তীকালেও বিস্তারিত কেউ লেখেন নি। ৮ জুন ইত্তেফাক, সংবাদ বন্ধ থাকে। দৈনিক সংবাদ ৯ জুন তারিখে নাটকীয়ভাবে শিরোনাম দেয়-‘আমাদের নীরব প্রতিবাদ’-“যে মর্মান্তিক বেদনাকে ভাষা দেওয়া যায় না, সেখানে নীরবতাই একমাত্র ভাষা। তাই গতকল্য সংবাদ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। আমাদের এই নীরব প্রতিবাদ একক হইলেও আমাদের পাঠকরাও শরীক হইলেন, ইহা আমরা ধরিয়া লইতেছি।”

নতুন প্রজন্মের সামনে আমরা কি বঙ্গবন্ধু’র ছয় দফাসহ তাঁর সংগ্রামের ইতিহাসগুলো উন্মোচন করতে পেরেছি কিনা। জানবার চেষ্টা করেছি, বোঝার চেষ্টা করেছি। ১৯৯২ সালে প্রোব বার্তা সংস্থা নামে একটি প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু, মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মাত্র ২০টি প্রশ্ন নিয়ে ঢাকা মহানগরের ২০০টি স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জরিপ করেছিল। দূভাগ্যজনক হলেও সত্য যে সেই জরিপে অংশগ্রহনকারী ৮৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। কেননা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর টানা একুশ বছর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তির দখলে ছিল। এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের টানা ১১ বছরে রাষ্ট্র পরিচালনায় থাকার কারনে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে উন্মোচিত হয়েছে।

দু’বছর আগে প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এক আলোচনা সভায় বলেছিলেন,‘ দেশে এখন যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তাতে বঙ্গবন্ধুকে জানার, উপলব্ধি করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। নতুন প্রজন্মের কাছে এই আহ্বান থাকবে, তারা যেন বঙ্গবন্ধুকে জানার চেষ্টা করে। নতুন প্রজন্ম যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার চেষ্টা করে। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর নাম এ দেশ থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। পারা যায়নি। বঙ্গবন্ধু এমনই এক মানুষ, যিনি আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্জন করেছিলেন।’ ১৯৬৬ সালের ৭ জুন আর ২০২০ সালের ৭ জুনের ৫৪ বছরের ব্যবধান । আজ আমরা যে সমৃদ্ধ অগ্রগতি যে জায়গায় এসে পৌঁছেছি তা বঙ্গবন্ধু ছয়দফার আন্দোলন থেকে উৎসরিত । এই মর্মকথা মর্মে ধারণ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনাকে ধারন করে উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণে কোন নেতা , কোন রাজনৈতিক দল উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারবে, সেই সিদ্ধান্ত তরুণ প্রজন্মকে ভেবেচিন্তে নিতে হবে। নিশ্চিতভাবে বলা যায় , গত এগারো বছর ধরে নানা প্রতিকূলতা পায়ে দলে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় তিন গুণ করেছেন, স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করেছেন তাই তাঁকেই নতুন প্রজন্ম সমর্থন দেবে ।

#

০৬.০৬.২০২০ পিআইডি ফিচার

সুভাষ সিংহ রায় : রাজনৈতিক বিশ্লেষক

**ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ**

**ছয় দফা: স্বাধিকার ও স্বাধীনতার সেতুবন্ধ**

মনজুরুল আহসান বুলবুল

৭ জুন ‘ছয় দফা দিবস’।

ছয় দফা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলতেন : সাঁকো দিলাম, স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য। আসলেই ছয় দফা আমাদের স্বাধীনতার ভ্রুণ। ছয় দফা বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের সাথে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের দৃঢ় সেতুবন্ধ। কেন ৭ জুন ছয় দফা দিবস ? একটু পটভূমি জানা দরকার।

১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয় দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর পর ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয় দফা আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। এর আগে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত বিরোধী দলের কনভেনশনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। তবে কনভেনশনের সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ছয় দফা নিয়ে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করতে দেননি। শেখ মুজিব ১১ ফেব্রুয়ারি দেশে ফিরে এসে ঢাকা বিমান বন্দরে সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফা সম্পর্কে বিস্তারিত জনসমক্ষে তুলে ধরেন। ছয় দফা প্রচার ও প্রকাশের জন্য শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ছয় সদস্য বিশিষ্ট উপকমিটি গঠন করা হয়। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত ছয় দফা নিয়ে গোটা পূর্ব পাকিস্তান চষে বেড়ান শেখ মুজিব ও তাঁর সহযোগীরা। ছয় দফার পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন দেখে ৮ মে প্রতিরক্ষা আইনে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। ছয় দফার পক্ষে জনসমর্থন এবং বন্দি নেতাদের মুক্তির দাবিতে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল ডাকে আওয়ামী লীগ।

১.

১৯৬৬ সনে জুনের সেই উত্তাল প্রথম সপ্তাহে কেমন ছিল পূর্ববাংলা ? কি ঘটেছিল সেই দিনগুলিতে তা’ পওয়া যাবে শেখ মুজিবের নিজের জবানিতে। মনে রাখতে হবে তখনও তিনি বঙ্গবন্ধু হননি। আওয়ামী লীগের নেতা এবং ছয় দফার স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে জেলে আটক শেখ মুজিব।

৬ জুন ১৯৬৬, সোমবার। কারাবন্দি শেখ মুজিব লিখেছেন : আগামীকাল ধর্মঘট। পূর্ববাংলার জনগণকে আমি জানি, হরতাল তারা করবে। রাজবন্দিদের মুক্তি তারা চাইবে। ছয়দফা সমর্থন করবে। তবে মোনায়েম খান সাহেব যেভাবে উস্কানী দিতেছেন তাতে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা যে তিনি করছেন। এটা বুঝতে পারছি। জনসমর্থন যে তার সরকারের নাই তা তিনি বুঝেও, বোঝেন না। [কারাগারের রোজনামচা, পৃষ্ঠা ৬৭ ]। দেশ জুড়ে টান টান উত্তেজনা। বন্দি শেখ মুজিব অস্থির, কিন্তু দেশের মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাসে অটল।

৭ জুন ১৯৬৬, মঙ্গলবার। শেখ মুজিব লিখছেন : ---- কি হয় আজ ? আবদুল মোনায়েম খান যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হয় কিছু একটা ঘটবে আজ। কারাগারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে খবর আসলো দোকান-পাট, গাড়ি, বাস রিকশা সব বন্ধ। শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল চলছে। এই সংগ্রাম একলা আওয়ামী লীগই চালাইতেছে। আবার সংবাদ পাইলাম পুলিশ আনসার দিয়ে ঢাকা শহর ভরে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই জনগণ বে-আইনি কিছু করবে না। শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশের মানুষের রয়েছে। কিন্তু এরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করতে দিবে না।

আবার খবর এলো টিয়ার গ্যাস ছেড়েছে। লাঠিচার্জ হতেছে সমস্ত ঢাকায়। আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না। কয়েদিদের কয়েদিরা বলে। সিপাইরা সিপাইদের বলে। এই বলাবলির ভিতর থেকে কিছু খবর বের করে নিতে কষ্ট হয় না। তবে জেলের মধ্যে মাঝেমধ্যে প্রবল গুজবও রটে। অনেক সময় এসব গুজব সত্যই হয়, আবার অনেক সময় দেখা যায় একদম মিথ্যা গুজব। কিছু লোক গ্রেপ্তার হয়ে জেল অফিসে এসছে। তার মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চাই বেশি। রাস্তা থেকে ধরে এনেছে। ১২টার পরে খবর পাকাপাকি পাওয়া গেল যে হরতাল হয়েছে। জনগন স্বতস্ফূর্র্ত ভাবে হরতাল পালন করেছে। তারা ছয় দফা সমর্থন করে আর মুক্তি চায়, বাঁচতে চায়, খেতে চায়, ব্যক্তি স্বাধীনতা চায়। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি, কৃষকের বাঁচার দাবি তারা চায় - এর প্রমাণ এই হরতালের মধ্যে হয়েই গেল।

এ খবর শুনলেও আমার মনকে বুঝাতে পারছি না। একবার বাইরে একবার ভিতরে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। বন্দি আমি, জনগণের মঙ্গল কামনা ছাড়া কি করতে পারি! বিকালে আবার গুজব শুনলাম গুলি হয়েছে, কিছু লোক মারা গেছে। অনেক লোক জখম হয়েছে। মেডিকেল হাসপাতালেও একজন মারা গেছে। একবার আমার মন বলে, হতেও পারে, আবার

-২-

ভাবি সরকার কি এতো বোকামি করবে? ১৪৪ ধারা দেওয়া নাই। গুলি চলবে কেন? একটু পরেই খবর এলো ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে, মিটিং হতে পারবে না। কিছু জায়গায় টিয়ার গ্যাস মারছে সে খবর পাওয়া গেল। বিকালে আরও বহু লোক গ্রেফতার হয়ে এলো। প্রত্যেককে সামারী কোর্ট করে সাজা দিয়ে দেয়া হয়েছে। কাহাকেও একমাস, কাহাকে দুই মাস। বেশির ভাগ লোকই রাস্তা থেকে ধরে এনেছে শুনলাম। অনেকে নাকি বলে রাস্তা দিয়া যাইতে ছিলাম ধরে নিয়ে এল। আবার জেলও দিয়ে দিল। সমস্ত দিনটা পাগলের মত কাটলো আমার। তালাবদ্ধ হওয়ার পূর্বে খবর পেলাম নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁ, কার্জন হল ও পুরনো ঢাকার কোথাও কোথাও গুলি হয়েছে, তাতে অনেক লোক মারা গেছে। বুঝতে পারি না সত্য কি মিথ্যা ! কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারি না। সেপাইরা আলোচনা করে, সেখান থেকে কয়েদিরা শুনে আমাকে কিছু কিছু বলে। তবে হরতাল যে পালন হয়েছে সে কথা সবাই বলছে। এমন হরতাল নাকি কোনদিন হয় নাই। এমনকি ২৯শে সেপ্টেম্বরও না। তবে আমার মনে হয় ২৯শে সেপ্টেম্বরের মতোই হয়েছে হরতাল। গুলি ও মৃত্যুর খবর পেয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। শুধু পাইপই টানছি - যে এক টিন তামাক বাইরে আমি ছয়দিনে খাইতাম, সেই টিন এখন চারদিনে খেয়ে ফেলি। কি হবে ? কি হতেছে? দেশকে এরা কোথায় নিয়ে যাবে, নানা ভাবনায় মনটা আমার অস্থির হয়ে রয়েছে। এমনিভাবে দিন শেষ হয়ে এল। মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা জেলে আছি। তবুও কর্মীরা, ছাত্ররা, শ্রমিকরা যে অন্দোলন চালাইয়া যাইতেছে, তাদের জন্য ভালবাসা দেওয়া ছাড়া আমার দেবার কিছু নাই। মনে শক্তি ফিরে এল এবং আমি দিব্যচোখে দেখতে পেলাম ‘জয় আমাদের অবধারিত’। কোন শক্তি আর দমাতে পারবে না। ---- [ কারাগারের রোজ নামচা, পৃষ্ঠা ৬৯/৭০ ] ।

৭ জুন কি ঘটেছিল তার এক পূর্ন চিত্র পাওয়া যায় বঙ্গবন্ধুর ৮ জুন লেখা ডায়েরির পাতায় ।

৮ জুন ১৯৬৬, বুধবার। শেখ মুজিব লিখছেন : ভোরে উঠে শুনলাম সমস্ত রাতভর গ্রেপ্তার করে জেল ভরে দিয়েছে পুলিশ বাহিনী। সকালেও জেল অফিসে বহুলোক পড়ে রয়েছে। প্রায় তিনশত লোককে সকাল ৮টা পর্যন্ত জেলে আনা হয়েছে। এর মধ্যে ৬ বৎসর বয়স থেকে থেকে ৫০ বছর বয়সের লোকও আছে। ------ এরা জেলে আসার পর খবর এল ভীষণ গোলাগুলি হয়েছে, অনেক লোক মারা গেছে তেজগাঁ ও নারায়ণগঞ্জে। সমস্ত ঢাকা শহরে টিয়ার গ্যাস ছেড়েছে, লাঠিচার্জও করেছে ।----- খবরের কাগজের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ------- আমি পূর্বে যে অনুমান করেছি তাই হলো। কোন খবরই সরকার সংবাদপত্রে ছাপতে দেয় নাই। ধর্মঘটের কোন সংবাদই নাই। শুধু সরকারি প্রেসনোট। ইত্তেফাক, আজাদ, অবজারভার সকলেরই একই অবস্থা। একই বলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা! ------ প্রতিবাদ দিবস ও হরতাল যে পুরাপুরি পালিত হয়েছে বিভিন্ন জেলায় সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ রইলো না। -------- পত্রিকার নিজস্ব খবর ছাপতে দেয় নাই। তবে সরকারি প্রেসনোটেই স্বীকার করেছে পুলিশের গুলিতে দশজন মারা গিয়েছে। এটাতো ভয়াবহ খবর। সরকার জখন স্বীকার করেছে দশজন মারা গেছে তখন কতগুন বেশি হতে পারে ভাবতেও আমার ভয় হলো! কতজণ জখম হয়েছে সরকারি প্রেসনোটে তাহা নাই ।------- ৭ই জুনের যে প্রতিবাদে বাংলার গ্রামগঞ্জে মানুষ স্বতঃস্ফূর্র্ত ভাবে ফেটে পড়েছে, কোন শাসকের রক্ত চক্ষুরাঙানি তাদের দমাতে পারবে না । ------ যে রক্ত আমার দেশের ভাইদের বুক থেকে বেরিয়ে ঢাকার পিচঢালা কাল রাস্তা লাল করলো, সে রক্ত বৃথা যেতে পারে না। [কারাগারের রোজনামচা, পৃষ্ঠা ৭১/৭২/৭৩ ]

২.

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে, ছয় দফা আসলে এক দফা। তারা প্রকাশ্যেই শেখ মুজিবকে লক্ষ্য করে বলতেন : ছয়দফা কর্মসূচি পাকিস্তান ভেঙে এর পূর্ব অংশকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। সে জন্য তাদের টার্গেট ছিল শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ। ৭ জুন একদিকে যেমন নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে ছয় দফার প্রতি পূর্ববাংলার মানুষের সমর্থন ঘোষণার দিন, তেমনি ছয় দফার প্রতি, বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর তীব্র আক্রোশ প্রকাশেরও দিন।

কি ছিল ছয় দফায় ? কেন এই ছয় দফা ? এই দফাগুলোর পটভূমিই বা কি ? আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গৃহীত হওয়ার পর ‘আমাদের বাঁচার দাবিঃ ছয় দফা কর্মসূচি’ শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এতে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছয় দফার দফাওয়ারী ব্যাখ্যা, পটভূমি, যুক্তি ও এই দফা এবং তাঁকে নিয়ে সমালোচনার জবাব তুলে ধরেন। [‘আমাদের বাঁচার দাবিঃ ছয় দফা কর্মসূচি’ শেখ মুজিবুর রহমান; তারিখ: ৪ঠা চৈত্র, ১৩৭২; ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬] এতে নিজেকে ‘খাদেম’ হিসেবে উল্লেখ করে শেখ মুজিব বলছেন : কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬-দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারী সহজসরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। [ এই নিবন্ধে সেই বক্তব্য গুলোর খুবই সংক্ষিপ্ত রূপ, ভাষা অবিকল রেখে তুলে ধরা হলো- নিবন্ধকার]

-৩-

১নং দফা : ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করত: পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। তাতে পালামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইন সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ব্যাখ্যায় শেখ মুজিব বলছেন : ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে আজমসহ সকল নেতার দেয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল।১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবি। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করিয়া আমি কোনও নতুন দাবি তুলি নাই।

২নং দফা : ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ওপর রাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

শেখ মুজিব ব্যাখ্যায় বলছেন: বৃটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে ‘প্ল্যান’ দিয়াছিলেন এবং যে ‘প্ল্যান’ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহন করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা,পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকীসব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেয়া হইয়াছিল। কংগ্রেস চুক্তি ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে ‘প্রদেশ’ না বলিয়া স্টেট বলিয়াছি। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই ‘প্রদেশ’ বা ‘প্রভিন্স’ না বলিয়া ‘স্টেটস্’ বলা হইয়া থাকে।

৩নং দফা : মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে।

ক. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পুর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র ‘স্টেট’ ব্যাংক থাকিবে।

খ. দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

শেখ মুজিব ব্যাখ্যা দিচ্ছেন: যদি আমার দ্বিতীয় অল্টারনেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজী না হন, তবেই শুধু প্রথম বিকল্প অর্থ্যাৎকেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে ‘পূর্ব পাকিস্তান’ বা সংক্ষেপে ‘ঢাকা’ লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে ‘পশ্চিম পাকিস্তান’ বা সংক্ষেপে ‘লাহোর’ লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শন স্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নকশার মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে।

৪নং দফা : সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধায্য ও আদায়ের ক্ষমতা থকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিকক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংক সমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

-৪-

শেখ মুজিব ব্যাখ্যায় বলছেন : আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধায্যের্র দায়িত্ব দেয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মত যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এটাই সরকারী তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তারা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্য্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। ৩ নং দফারব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থদফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। আমার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রেও এমন বিধান থাকিবে যে, আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য্য ও আয় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সে টাকায় হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকার আঞ্চলিক সরকারের কোন হাত থাকিবে না।

৫নং দফা: বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশকরিয়াছি : ১। দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে। ২। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে। ৩। ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে। ৪। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী রফতানী চলিবে। ৫। ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্তকরিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

শেখ মুজিব ব্যাখ্য দিচ্ছেন : পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩নং দফার মতই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলাইলেই দেখা যাইবে যে- ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিতবিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে। খ) পূর্ব পাকিস্তানে মুলধন গড়িয়া না উঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না। গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তানে যে পরিমাণ রফতানী করে আমদানী করে সাধারণতঃ তার অর্ধেকের কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশী। বিদেশ হইতে আমদানী করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা। ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মুল্য তো দূরের কথা আবাদী খরচাটাও দেয়া হয় না। ফলে পাটচাষীদেও ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না।

৬নং দফা : পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ ।

শেখ মুজিব বলছেন: এ দাবী অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম। তাতো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ইপিআর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেয়াহইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন্ মুখে? মাত্র সতর দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যতঃ আমদেরকে তাই করিয়া রাখিয়াছে।তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্ননির্ভও করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। অস্ত্র কারখানা স্থাপন করুন। নৌ-বাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন।

-৫-

ছয়দফা নিয়ে যাতে কোন বিভ্রান্তি না হয়, পশ্চিম পাকিস্তানে সাধারন মানুষ যাতে ছয় দফাকে ভুল না বুঝেন সে জন্য শেখ মুজিব বলছেন : এক. মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ৬-দফা কর্মসূচীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবি স্বীকৃত হইলে পশ্চিমপাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন। দুই. আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে তখন আমিও আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, এ বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরাই দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মত দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না? কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে।

শেখ মুজিব নিজের উদারতার চিত্র তুলে ধরে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বলেন :

১। প্রথম গণ-পরিষদে আমাদের মেম্বর সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশ রক্ষার সদর দফতর পূর্বপাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।

২। পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাই এর দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানীর ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বর নির্বাচন করিয়াছিলাম।

৩। ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবি করিয়াছিলাম।

৪। ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

৫। আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্যউভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাস আমরা সংখ্যা গুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে যেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল, আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার। থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। --- আশা করি, আমার পশ্চিমপাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ছয়-দফা কর্মসূচীর বিচার করবেন। তা যদি তাঁরা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ছয়-দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, গোটাপাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি।

শেখ মুজিব তাঁর দৃঢ় অবস্থান তুলে ধরে বলছেন: পূর্বপাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল জুলুমের ঝুঁকিলইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল জুলুম ভুগিবার তকদির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে সব সহ্যকরিবার মত মনের বল আল্লাহ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমারদেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুমদেশবাসীর বাঁচার দাবির জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছুই আছে বলিয়া আমিমনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞানলাভ করিয়াছি। তাঁর পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই বোনেরা আল্লাহর দরগায় শুধু এই দোয়া করিবেন, বাকীজীবনটুকু আমি যেন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি। ইতিহাস সাক্ষী দেবে শেখ মুজিব জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর ওয়াদা রক্ষা করেছেন।

৩.

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেন, ইংল্যান্ডের ‘ম্যাগনা কার্টা’ যেমন বিশ্বকে পরিবর্তিত করেছে, বাংলাদেশের ‘ম্যাগনা কার্টা’ ‘ছয়দফা’ তেমনি শুধু বাঙ্গালীর ভাগ্য পাল্টায় নাই, পৃথিবীর শোষিত মানুষের ভাগ্য বদলের ম্যাগনাম্যাগনাকার্টা হিসেবেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু যেমন বলতেন, পৃথিবী আজ দুইভাগে বিভক্ত - শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে। ছয় দফার প্রতিটিতেই তাঁর এই দর্শন উজ্জ্বল ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

সে জন্য ছয় দফা শুধু বাঙালী জনগোষ্ঠীর নয়, বিশ্বের সকল শোষিত মানুষেরই মুক্তি সনদ ।

#

০৬.০৬.২০২০ পিআইডি ফিচার

**ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ**

**৬ দফা থেকে স্বাধীনতা**

সেলিনা হোসেন

আজ ৭ই জুন। ১৯৬৬ সালের এই দিনে প্রবল প্রতিরোধে তখনকার পূর্ববাংলায় পূর্ববঙ্গবাসী বঙ্গবন্ধুর উত্থাপিত ৬ দফার স্বীকৃতির জন্য রাজপথে নেমেছিল প্রবল প্রতিরোধে। বাঙালির অধিকার বিমূর্ত হয়েছিল ৬ দফার দাবিতে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর কৈশোর থেকে সূচিত রাজনৈতিক জ্ঞানের ধারাবাহিকতায় তৈরি করেছিলেন বাঙালির অধিকার সচেতনতার মূল সূত্র ৬ দফা কর্মসূচি। তিনি এই রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞকে ‘আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি ‘শিরোনামে পাকিস্তানে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে আইয়ুব খানের বিরোধী দলগুলো একটি বৈঠকে বসে। এই সভায় বঙ্গবন্ধু ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক নেতারা ৬ দফা দাবিকে সমর্থন করে না। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশই নানাভাবে শোষিত বঞ্চিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হলে সবাই সন্ত্রস্থ হয়ে যায়। তারা ৬ দফাকে পাকিস্তানকে ভেঙে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখে এবং এর তীব্র বিরোধিতা করে।

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৭ দিন যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধ চলার সময় পূর্ব পাকিস্তানকে একদম অরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং অস্ত্রশস্ত্রের এমন অবস্থা ছিল না যে ভারতের আক্রমণের মোকাবেলা করতে পারত। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছিলেন এভাবে যে, চীনের ভয়ে ভারত পূর্বপাকিস্তানে যুদ্ধে জড়াতে সাহস করেনি। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘পূর্ব পাকিস্তানকে ১৭ দিন যুদ্ধকালীন সময়ে এতিমের মতো ফেলে রাখা হয়েছে। ভারতীয় সৈন্যরা যদি দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত লেফট রাইট করে হেঁটে যেত তবুও তাদেরকে বাধা দেওয়ার মতো অস্ত্র বা লোকবল কিছুই পূর্ব বাংলার ছিল না। আর চীনই যদি আমাদের রক্ষাকর্তা হয় তবে পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে চীনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেই হয়।”

বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রবলভাবে মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হন। তিনি পূর্বপাকিস্তানবাসীর অধিকারের ৬ দফা দাবী প্রণয়ন করেন।

লাহোর থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু। ঢাকা বিমানবন্দরে নামার পরে সাংবাদিকদের ছয় দফার ব্যাখ্যা দেন। এই দফাকে বাঙালির মুক্তিসনদ বলে উল্লেখ করেন। এরপরে তিনি ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার পক্ষে দেশের প্রতিটি জেলায় জনসমাবেশ করেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়ে ছয় দফার কথা শোনেন। এই দফার শেষ দফায় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেন।

তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যে বক্তৃতা করেন তার শুরুটা এমন :

‘আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবিরূপে ৬ দফা কর্মসূচি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমি স্বার্থীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিতি। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়াই উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি-সনদ একুশ দফা দাবি, যুক্ত-নির্বাচন-প্রথার দাবি, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্প-ব্যয়ে শিক্ষা-লাভের দাবি, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত-বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি- তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে।’

তিনি শেষ করেছেন এভাবে -‘আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬ দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তানবিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তিতর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমি স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মতো মুরুব্বিরাই এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে বাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে

-২-

কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তক্দির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোওয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সেসব সহ্য করিবার মতো মনের বল আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানির ভালোবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে-কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছুই আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁহার পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা আল্লাহ্র দরগায় শুধু এই দোয়া করিবেন, বাকি জীবনটুকু আমি যেন তাঁহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি-সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

আপনাদের স্নেহধন্য খাদেম

শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৬৬ সালের ৮ই মে নারায়ণগঞ্জে আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করার পরে দেশরক্ষা আইনের ৩২ নম্বর ধারায় শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর সাংবাদিকদের বলতেন, ‘আমি যতদিন গভর্ণর, শেখ মুজিবকে জেলেই থাকতে হবে।’

৬ দফা কর্মসূচি বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের পরে ব্যাপক আকার ধারণ করে। জনগণ মিছিলে গণআন্দোলনের প্রতিষ্ঠায় উজ্জীবিত হয়। প্রায় আটশত লোককে গ্রেফতার করে মোনেম খান। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং ৬ দফার সমর্থনে হরতাল পালন শুরু করে। ছাত্রজনতা ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে ১৪৪ ধারা জারী করে গভর্ণর। স্লোগান ওঠে ‘জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনব।’

এই সময় শেখ মুজিবকে প্রধান আসামী করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা জারী করা হয়।’ প্রবল প্রতিরোধে উত্তাল হয়ে ওঠে পূর্ববঙ্গবাসী।

আওয়ামী লীগ ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে’ প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললে পুলিশের নির্যাতনে শহীদ হয় অনেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ ‘সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করে ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলনের সূত্রপাত করে। এই আন্দোলনের প্রথম শহীদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান পরে শহীদ হয় স্কুলছাত্র মতিউর রহমান। শহীদ হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের চাপে ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করেন। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করা হয় লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে।

১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ সামরিক শাসক আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। পুরো পাকিস্তানে দ্বিতীয় বারের মতো সামরিক শাসন জারি হয়। ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন করার কথা ঘোষণা করে। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন, কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁকে প্রধানমন্ত্রী না করার জন্য ষড়যন্ত্র করে। ইয়াহিয়া খান সংসদ অধিবেশন স্থগিত করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশব্যাপী শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ভাষণে বলেন, ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’

শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ৬ দফার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সায়ত্ত্বশাসন চেয়েছিলেন। ৫ বছরের ব্যবধানে তিনি স্বাধীন দেশের স্থপতি হন।

৬ দফা থেকে স্বাধীনতা এই ছিল গৌরবের ইতিহাস।

#

০৪.০৬.২০২০ পিআইডি ফিচার

**ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ**

**ছয় দফার সঙ্গে তৈরি ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের ছকও**

অজয় দাশগুপ্ত

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্ত শাসনের ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। এ কর্মসূচিতে ছিল-পাকিস্তান ফেডারেশনে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, সার্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রবর্তন; ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; পূর্ব ও পাশ্চিম পাকিস্তানে পৃথক কিন্তু সহজে বিনিময়যোগ্য পৃথক মুদ্রা চালু কিংবা একক মুদ্রা, তবে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপন; সব ধরনের কর ও শুল্কধার্য ও আদয় করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে; দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে, অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা থাকবে প্রদেশের হাতে এবং প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে সাবলম্বী করার জন্য নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থানান্তর, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন ও আধাসামরিক রক্ষীবাহিনী গঠন।

তৎকালীন পাকিস্তানের ক্ষমতার কেন্দ্র লাহোরে তিনি যখন এ কর্মসূচি প্রকাশ করেন, প্রেক্ষাপট ছিল ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। বিশেষভাবে রাজস্ব ভাগ বাটোয়ারা ও নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ইস্যু প্রধান্য পায়। রাজনৈতিক মহল, সুধী সমাজ, গবেষক, সাংবাদিক এবং উদীয়মান বাঙালি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণি দ্রুতই বুঝে গেল- মুক্তির পথ চিহ্নিত হয়ে গেল। শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক কৌশলেও অন্য সবাইকে বহু যোজন পেছনে ফেলে দিতে পেরেছিলেন। হরতাল-ধর্মঘট নয়, তিনি কর্মসূচি নিয়ে চলে গেলেন জনগণের কাছে।

পাকিস্তানের শাসকরা বুঝতে পারে, এতদিন যে দাবি নিছক রাজনৈতিক দলের সম্মেলন ও জনসভার প্রস্তাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল- তা নতুন মাত্রা পেয়েছে। বাঙালিরা হিসেবের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে প্রস্তুত হয়ে উঠছে। দাবি আদায়ে সংগঠন চাই, আন্দোলন চাই এবং তার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের প্রয়োজন পড়বে সে উপলব্ধিও ততদিনে হয়ে গেছে। নেতাও পেয়ে গেছেন তারা। আগরতলা ষড়যন্ত্রের দায়ে যখন তাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা হয়, তখন জনগণ এই মহান নেতাকে বরণ করে নেয় বঙ্গবন্ধু হিসেবে।

নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ধারণা অবশ্য বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই সামনে আনেন। বয়স যখন মাত্র ২৯ বছর- আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক- ১৯৪৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর আরমানিটোলা ময়দানে ছাত্রলীগ আয়োজিত জনসভায় তিনি বলেছিলেন, ‘পাঞ্জাবি সৈন্যরা পূর্ব বাংলার ভৌগলিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত নয়। আমাদের দেশের নিরাপত্তা আমাদেরই নিশ্চিত করতে হবে।’

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি যে সংগঠনের জন্ম দেন, সেই ছাত্রলীগ থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নেওয়ার জন্যই আয়োজন হয়েছিল সম্মেলনের। গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্মেলন ও জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান প্রাপ্তবয়স্ক সকল ব্যক্তিকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান এং প্রয়োজন পড়লে দেশ রক্ষার জন্য তাদের অস্ত্র সরবরাহের দাবি জানান।

বঙ্গবন্ধু এটাও জানা হয়ে গেছে, বাঙালির স্বার্থের বিরুদ্ধ শক্তি প্রবল ক্ষমতাধর এবং তাকেই আঘাতের টার্গেট করবে। ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরাও বাদ যাবে না। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামের সময়ে বলেছিলেন, ‘আমি যদি হুকুম দেবার না পারি...’- অবাক বিস্ময়ে আমরা দেখি, এ ঐতিহাসিক দিনের পাঁচ বছর আগে ছয় দফা প্রদানের পরপরই তিনি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন- মুক্ত জীবনে তাকে রাখা হবে না। সচেতন প্রয়াসে এমন অবস্থা তৈরি করতে পারেন যেন আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে না যায়। জনগণকে তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। তরুণ সমাজ এগিয়ে এসেছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ের মতো সাহস ও সংকল্প নিয়ে। নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। আদমজী-ডেমরা-টঙ্গী-তেজগাঁয়ের শ্রমিকরা আন্দোলনে সক্রিয় হচ্ছে। ‘বাংলাদেশ’ দৃষ্টি সীমানায় এসে পড়েছে। ‘স্বাধীনতা’ নিষিদ্ধ শব্দ। কিন্তু অনেকেই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে উঠছেন-পিন্ডি বা লাহোর নয়, ঢাকাতেই এ ভূখণ্ডের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

বঙ্গবন্ধু ছয় দফা প্রদানের পর আওয়ামীলীগকে নেতৃত্ব শূন্য করার জন্য ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এবং তাঁর দুষ্কর্মের সহযোগী পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান একের পর এক দুরভিসন্ধি আঁটেন। কিন্তু বাঙালিরা অবাক বিস্ময়ে দেখল, দলের সভাপতি ও অন্যান্য নেতা গ্রেফতার হওয়ার এক মাসপূর্ণ হওয়ার আগেই গোটা পূর্ব পাকিস্তানে যারা হরতাল আহ্বান করেছিল, তাদের মধ্যে প্রাদেশিক কমিটির শীর্ষ স্থানীয় কোনো নেতাই ছিলেন না।

‘কারাগারের রোজ নামচা’ গ্রন্থে এই ঐতিহাসিক তারিখে (৭ জুন, ১৯৬৬। মঙ্গলবার) শেখ মুজিবুর রহমান দিনলিপি বা ডায়েরি শুরু করেছেন এভাবে- ‘সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। কি হয় আজ? আবদুল মোনায়েম খান যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হয় কিছু একটা ঘটবে আজ। কারাগারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে খবর আসলো দোকান-পাট, গাড়ি, বাস, রিকশা সব বন্ধ। শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল চলেছে। এই সংগ্রাম একলা আওয়ামীলীগই চালাইতেছে। আবার সংবাদ

-২-

পাইলাম পুলিশ আনছার দিয়া ঢাকা শহর ভরে দিয়েছে। ...আবার খবর এল টিয়ার গ্যাস ছেড়েছে। লাঠিচার্জ হতেছে সমস্ত ঢাকায়। আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না। কয়েদিরা কয়েদিদের বলে। সিপাইরা সিপাইদের বলে। এই বলাবলির ভিতর থেকে কিছু খবর বের করে নিতে কষ্ট হয় না। ...জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করেছে। তারা ছয় দফা সমর্থন করে আর মুক্তি চায়, বাঁচতে চায়, খেতে চায়, ব্যক্তি স্বাধীনতা চায়। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি, কৃষকের বাঁচবার দাবি তারা চায়-এর প্রমাণ এই হরতালের মধ্যেই হয়ে গেল।’

ছয় দফা প্রদানের পর থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান ঘনিষ্ঠজনদের কাছে বলছিলেন, ছয় দফা মানলে ভাল। না মানলে এক দফা। তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য যে স্বাধীনতা এবং এ জন্য ধাপে ধাপে কুশলী পদক্ষেপ নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন- সেটা গোপন করেননি কখনও।

এক দফার আন্দোলন যখন সামনে এলো, তিনি দীর্ঘ দুই যুগের সাধনায় যা কিছু তৈরি করেছেন, একে সব কাজে লেগে গেল- জনগণপ্রস্তুত, সংগঠিত ছাত্র-তরুণরা। দেশব্যাপী নিষ্ঠুর গণহত্যার মধ্যেই ২৫ মার্চের দুই সপ্তাহ যেতে না যেতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন ও সক্রিয় কার্যক্রম শুরু করতে পারা গোটা বিশ্বকেই বিস্মিত করে। আর কী অনন্য দূরদর্শিতা- ১৯৪৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দাবি তুলেছিলেন প্রাপ্ত বয়স্কদের সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসজ্জিত করার। সেটা পাকিস্তানের শাসকরা করেনি। বাংলাদেশের লাখ লাখ ছাত্র-তরুণ সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে অস্ত্র তুলে নিয়ে ছিল বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে তাড়াতে। ২৬ মার্চ এ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

ছয় দফা থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের কাল পর্ব আমাদের যে সব রাজনৈতিক শিক্ষা দেয়- এক, সঠিক সময়ে সঠিক কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন কৌশল উপস্থাপন। দুই, উপযুক্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি। তিন, জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করা। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল আওয়ামীলীগ এটা করতে পেরেছিল বলেই ১৯৬৬ সালের ৭ জুনের হরতালে অভাবনীয় সাড়া মিলেছিল, ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির ছাত্র-গণঅভ্যুত্থান সফল হয়েছিল এবং ১৯৭১ সালে বিপুল আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছিল স্বাধীনতা।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের প্রস্তুতি চালানোর পর্যায়েই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ছক তৈরি করে ফেলেছিলেন। এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্রসহ কতিপয় ধনবান দেশ ও বিশ্বব্যাংক যে নতুন রাষ্ট্রকে ‘বাস্কেট কেস’ হিসেবে উপহাস করেছিল, স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সে দেশটিই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের বিপুল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে পারে।

আবার ২১ বছরের দুঃশাসনের পর বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব হাতে নিয়ে যে দেশকে সমৃদ্ধির সোপানে তুলে দিতে অনন্য সফলতা দেখাতে পারে তারও প্রেরণা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ ভূখণ্ড এবং তার মানুষের ওপর অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা রাখার কারণেই বাংলাদেশে ঘুরে দাঁড়াতে পারছে বহুবিধ বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে। তলাবিহীন ঝুঁড়ির বদনাম ঘুচিয়ে দেশটিকে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা, কুচক্রি মহলের কারণে বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুতে অর্থ জোগানো বন্ধ করে দেওয়ার পর নিজস্ব অর্থে যোগাযোগ খাতের এ সুবৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে গর্বিত পদচারণা, প্রায় ছয় কোটি ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে আসতে পারা- বাংলাদেশের এ ধরনের আরও উজ্জ্বল উদাহরণ এখন বিশ্ব নেতৃবৃন্দই দিচ্ছেন। করোনাত্তোরকালে বাংলাদেশ যে উন্নয়নের সঠিক ও টেকসই ধারায় চলতে পারবে, সে ভরসাও কিন্তু আমরা পেয়ে যাই বঙ্গবন্ধু কন্যার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী কর্মসূচি ও কর্মকৌশলের কারণে। সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি দৃঢ় সংকল্পে করে ফেলা- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষা যে তিনিই সবচেয়ে বেশি ধারণ করেন।

#

০৩.০৬.২০২০ পিআইডি ফিচার